“যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের হিংস্রতা আল্লাহ্ বন্ধ করবেন”

শায়খ ইবরাহীম আর রুবায়শ

“অতএব যুদ্ধ করো আল্লাহ্‌র পথে, তোমার উপর শুধু তোমার নিজের দায় ছাড়া অন্যথা চাপানো হয় নি, আর বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করো। হতে পারে যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের হিংস্রতা আল্লাহ্‌ বন্ধ করবেন। আর আল্লাহ্‌ বিক্রমে কঠোরতর, আর লক্ষণীয় শাস্তিদানে আরো কঠোর।” [৪: ৮৪]

এই পবিত্র আয়াতে, আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর রসূল(সাঃ) কে তাঁর পথে যুদ্ধ করার জন্য যদিও তাকে একাকী করতে হয় । তারপর তিনি তাঁর লক্ষ্যও স্পষ্ট করে দিয়েছেনঃ

“তিনি কাফিরদের হিংস্রতাকে দমন করে দিবেন, আল্লাহ্‌ই বিক্রমে অধিক শক্তিশালী এবং তিনি শাস্তি দিতে পারেন তাঁর শত্রুদের মাঝ থেকে যাকে তিনি ইচ্ছে করেন। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্‌ মুমিনদের লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য যে তিনি তাদেরকে সম্মানিত করতে পারেন এবং তাদের মাঝ থেকে কতককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।”

আল্লাহ্‌ বলেন,

“আর আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন তাহলে তিনিই তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু (তিনি যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন) এইজন্য যে তোমাদের কতককে যেন অপরের দ্বারা তিনি সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারেন।” [৪৭: ৪]

ইমাম আল-বাঘাওয়ি আগের আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,

“এর দ্বারা বুঝা যায়ঃ শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ কখনই পরিত্যাগ করা যাবে না এবং মজলুমদের সহায়তা করতে হবে যদি তুমি একাকীও হও । নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ তোমাদের বিজয়ের ওয়াদা করেছেন এবং অন্যদের শাস্তি দিয়েছেন জিহাদ পরিত্যাগ করার জন্য।”

ইমাম আল-কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে 'আতিয়ার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন,

“এটা শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে, কিন্তু এরূপ কখনও বর্ণনায় আসেনি যে, যুদ্ধ শুধুমাত্র তাঁর (সাঃ) এর উপর ফরয করা হয়েছে তার বাকি উম্মাহকে বাদ দিয়ে। সুতরাং- আল্লাহই ভাল জানেন- মূলত শাব্দিকভাবে শুধু তাঁকে (সাঃ) উদ্দেশ্য করে বলা হলেও, এর দ্বারা তাদের সকলকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা তার (সাঃ) এর অনুসরণ করে, উদাহরণস্বরূপঃ তুমি হে মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তোমার উম্মাতের প্রত্যেকেই । তাই এই দায়িত্ব প্রত্যেক ঈমানদারের উপরই বর্তায় যদিও সে একাকী হয়।”

আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন,

“আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার গলা কাটা হয়।”

এবং আবুবকর (আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হোন) মূর্তিপূজার যুগে বলেছিলেন,

“এবং যদি আমার ডান হাত আমার সাথে অসহযোগ করে, আমি আমার বাম হাত দিয়ে যুদ্ধ করে যাব।”

নিশ্চয়ই এই আয়াতে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে কুফফারদের সাথে যুদ্ধ করার - যত বৃহৎ বা শক্তিশালী হোক না কেন, এবং কোন যোদ্ধা যদি একাকীও হয় - আল্লাহ্ তাদের হিংস্রতা দমন করবেন যারা অবিশ্বাস পোষণ করে। আর এটাই তা যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে প্রকাশ করেছেন, এবং ইতিহাসে যার সাক্ষী রয়েছে। অপরদিকে, কুফফারের সাথে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি পরিত্যাগ করা, কুফফারের হিংস্রতা বৃদ্ধি হতে দেওয়া এবং ঈমানদারদের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং আজকের পরিস্থিতি তারই যথেষ্ট সাক্ষী।

ধি-ক্বিরদ এর যুদ্ধে, সালামাহ ইবুনল আকওয়া’ (আল্লাহ্‌ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) পায়ে হেঁটে একাকী অগ্রগামী হয়েছিলেন এবং যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি পুনরুদ্ধার করেছিলেন যা শত্রুপক্ষ চুরি করেছিল, অধিকতর, তিনি লাভ করেছিলেন গনীমত। সাহাবাগণ তার সাথে মিলিত হবার আগেই তিনি এ সব কিছুই একা করতে সক্ষম হোন। এই গল্পটিই দলীল হিসেবে যথেষ্ট উপরে উল্লিখিত আয়াত বুঝার জন্য।

আমাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে আমাদের শক্তিমত্তার সমতার প্রয়োজন নেই । বরং শক্তিমত্তার সমতার নিদর্শন ইসলামে খুবই দুর্লভ । মুসলিমরা সবসময়ই সংখ্যায় কুফফারদের থেকে কম ছিল। অধিকতর, কোন বৃহৎ সংখ্যা পরাজয়ের একটা কারণ হয়, যেমনটা হয়েছিল হুনাইনের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে রণবাহিনীর অধিকাংশই পলায়নপর হয়েছিলেন এবং দৃঢ়পদ সাহাবাদের পেছনে ফেলে চলে গিয়েছিলেন যারা পরবর্তীতে বিজয় ও অধিকরণ অর্জন করতে পেরেছিলেন। এবং আমরা যদি আল্লাহ্‌র কথাগুলোর দিকে লক্ষ্য করি,

“এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে থাক তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী”

আমরা বুঝতে পারব যে প্রস্তুতি নেওয়া হয় সামর্থ্যানুযায়ী, তারপর যথাসাধ্য উপায়ে যুদ্ধ করে যেতে হবে যদি এক্ষেত্রে আমাদের কাছে পাথর ব্যাতীত অন্য কিছুও যদি না থাকে। শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া বলেছেন,

“এবং মুসলিমদের মধ্যে যারাই কুফফারদের সাথে একটি তলোয়ার, একটি বর্শা, একটি তীর, একটি পাথর অথবা একটি লাঠি দিয়েও যুদ্ধ করে সেই আল্লাহ্‌র রাহে একজন মুজাহিদ।”

উদাহরণস্বরূপ, ইসরাইল তার সীমান্ত সম্প্রসারণে ব্যর্থ হয়েছে যদিও এর প্রতিষ্ঠার দশক পার হয়ে গেছে এবং পাথর হাতে শিশুরা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন প্রতিরোধও নেই। এটা একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে কুফফারদের সাথে লড়াই করা হচ্ছে সেই কারণ যার দরুন আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদের হিংস্রতা দমন করেন, এই শর্তে যে,

"কোন যুদ্ধবিরতি নয়, কোন আপস নয়"

এবং কখনই আমাদের হাত শত্রুদের হাতের উপর থাকবে না অর্ধেক কোন সমাধানের লক্ষ্যে, বরং আমাদের শত্রুদেরকে মোকাবেলা চালিয়ে যেতে হবে।

একই কথা সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এর বিশাল রাষ্ট্রীয় অস্ত্রাগার থাকার স্বত্বেও, এটি আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায় একটি বিশ্রামাগার খোঁজার আশায়। সেখানে তখন মুজাহিদীনরা ছিলেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন । তারপরও মুজাহিদীনরা তাদের কাছে থাকা সামান্য অস্ত্র নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় তারা সেই কারণ হয়ে উঠেন যার দরুন শত্রুদের হিংস্রতা দমিত হয় এবং বিজিত শত্রুরা ত্বরিত পশ্চাদপসরণ করে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল খুবই বিস্ময়কর। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন,সরকারগুলো মুসলিমদের জিহাদে যেতে বাঁধা দেয় নি। এমনকি কিছু তো মুজাহিদীনদের জন্য সহজসাধ্য ব্যবস্থা ও শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কিন্তু আজ আমেরিকার সাথে যে কেউই জিহাদে যেতে চায় অথবা মুজাহিদীনদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করে তার ভাগ্য যেন পূর্বনির্ধারিত; কারাগারের পেছনে নিহিত কল্যাণ। ভেতরে তার অবস্থান অস্তিত্বহীন, আর বাইরে অস্তিত্ব শুধু জন্ম সনদের। এসবকিছুর সাথে, এক দশক যুদ্ধের পর আমেরিকার জন্যও অপেক্ষা করছে একটি বীভৎস চমক।

ম্যানহাটানের যুদ্ধের পর আমেরিকা একটুও ইতস্তত বোধ করেনি আফগানিস্তান আক্রমণ করতে। ইহা কিছু মাত্রও থামেনি ইরাক দখল করতে যখন সে অন্যান্য ভূমিগুলোতেও তার দোসর দিয়ে খেলা চালিয়ে যাচ্ছিল- যারা তথাকথিত মুসলিম শাসক- তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একজন আমেরিকান কর্মকর্তা একবার এক লিবিয়ান দূতকে বলেছিল যে গাদ্দাফি কথা শুনত না যদি না সে দেখত যে সাদ্দাম কূপ থেকে বেরিয়ে আসছে, ঘটনাটি আস-সাহাব মিডিয়ার একটি প্রযোজনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই অবকাশ বেশী দিন টেকসই হয়নি, যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা পূর্বনির্ধারিত যে, কোন কিছুই উত্থান লাভ করতে পারবে না যদি তিনি তা অবদমিত করেন। আর ইরাকে অনুপ্রবেশ করতে না করতেই তারা এটা স্বীকার করে নেয় যে ইরাক আক্রমণ তাদের ভুল ছিল। তারপর তারা একটু একটু করে পিছু হটতে থাকে, এই দাবী করে যে, তাদের লক্ষ্য নাকি সফলকাম হয়েছে। যখনই লিবিয়ায় বিপ্লব শুরু হল আমেরিকা তার সহযোগী দোসরদের নেতৃত্ব দেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওবামা ঘোষণা দিল যে, লিবিয়া আক্রমণ করে সে ইরাক ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না। সে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে ঘোষণা দিল যে, এতে তার জনবল ও অর্থের মাশুল গুণতে হবে। ঠিক তেমনটিই বলল তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী,

“আমাদের জন্য সিরিয়ায় হস্তক্ষেপের অপেক্ষা করো না যেমনটা লিবিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা করিনি।”

ঠিক একই সময়ে তারা প্রত্যক্ষ করে সোমালিয়ায় আমাদের ভাইদের যারা ইসলামী রাষ্ট্রের খুঁটিসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন, আর তারা তো এখন আগ্রাসন চালানোর কথা চিন্তাই করতে পারে না, বরং তারা কিছু গুপ্তচর পাঠিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে।

তারপর আসে পশ্চিমাদের মালি আগ্রাসন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একটি সুসংবাদ, একটি দুর্বল এবং শীর্ণকায় আক্রমণ। সকল কাফির বাহিনী এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। সবাই একমত হল, তারা মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু যখন আক্রমণের সময় এলো প্রত্যেকে বলতে লাগল ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! (আমার জান! আমার জান! অর্থাৎ, আতংকে তারা শুধু নিজের জান এর চিন্তা করতেই সমর্থ্য ছিল) এবং কে ভেবেছিল যে এই আমেরিকাই হাত গুঁটিয়ে বসে থাকবে যেখানে মুজাহিদীন গ্রুপ অবলীলায় নিয়ন্ত্রণ করছেন অধিকাংশ ভূমি, কোন সম্মুখ আক্রমণ ছাড়াই?

এটা মুসলিমদের জন্য একটি সুসংবাদ যে, আমেরিকান আধিপত্যের যুগ ফুরিয়ে এসেছে। সে সময় শেষ হয়ে এসেছে যখন মুসলিমরা আমেরিকাকে একটি অপ্রতিরোধ্য বাহিনী হিসেবে দেখত এবং মনে করত যে পৃথিবীতে যা কিছুই ঘটছে এর পেছনে তারা রয়েছে । এই ভাইরাসটি (অর্থাৎ, আমেরিকাকে পরাক্রমশালী মনে করার মানসিকতা) যদি এখনও কোন মুসলিমের মধ্যে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার ক্ষেত্রে এটি এই অবস্থায় আছে যে,

"অভ্যাস পরিবর্তন কষ্টসাধ্য"

এসব কিছু কখনই হত না যদি না এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য না হয়ে শুধু মুজাহিদীনদের কাজ হতো। নিশ্চয়ই, রক্ত ঝরেছে ইরাকে এবং আফগানিস্তানে, যা একটি ত্যাগ-তিতিক্ষা আল্লাহ্‌র জন্যেই, যা আমেরিকাকে বাধ্য করে বিপর্যয় গলাধঃকরণ করতে। আর সেই রক্তেই, আল্লাহ্‌ অবদমন করেন তাদের হিংস্রতা যারা অবিশ্বাস পোষণ করে।

অপরদিকে, আমরা যদি সেই আশ্চর্যান্বিত আহবানগুলো শুনতাম যেখানে রক্তপাত বন্ধের জন্য প্রতিরোধ থেকে সরে আসার বাণী প্রচারিত হচ্ছিল, তাহলে আমেরিকা বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ত, এবং আমাদের আরও অপমানের সহিত জীবনধারণ করতে হত। তারা আমাদেরকে ভেড়ার ন্যায় জবেহ করত আর আমাদের সম্মানের পরিধান হরণ করত আর তখনও আমরা এই বুলি আওড়াতামঃ সাদা ষাঁড়টি যেদিন খেতে পেয়েছে আমরাও সেদিন খেতে পেয়েছি।

এগুলো আরও সুস্পষ্ট হয়েছে এই যুগে জিহাদের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ উম্মাহর মধ্যে জিহাদের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করে। যদিও এই যুদ্ধে আমাদের বহু লোককে হারাতে হয়েছে, তারপরও এতে উম্মাহর অসংখ্য কল্যাণ সাধিত হয়েছে। তারপর আসলো আমেরিকার সাথে জিহাদ, এটি যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল করে তুলে এবং বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। ইহা উম্মাহর মধ্যে বিশ্বাসঘাতক শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের বীজ বপন করে দেয়, এবং যার ফল এখনও পরিপক্কতা পাচ্ছে।

এই যুদ্ধ যেন বাতাসের মতো। ইহা মেঘমালা আচ্ছাদিত করে, যার ফলে বৃষ্টিপাত হয়, যা উপত্যকা ও পর্বত অতিক্রম করে আবার পূর্ণতা পায়। জমি আর্দ্রতা পায়, ঘাসের অঙ্কুর হতে শুরু করে। পানিপথগুলো একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে বন্যা ঘটায়, অথবা প্রবল স্রোতের তৈরি করে যা জালিমদের ও তাদের নজিস দুনিয়ার বুক থেকে ধুয়ে নিয়ে যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রগুলো পরস্পরের সামর্থ্য সঞ্চয়ে সহায়তা করে চলেছে, যদিও তাদের মাঝে হয়ত কোন যোগাযোগ বিদ্যমান নয়। ইহা কিছু না বরং সময়ের সাথে শক্তিসঞ্চয়। প্রথম দিকে মুজাহিদীনরা বিভিন্ন বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, শাহাদাতি অভিযান, বিস্ফোরক-লাদেন বাহন। পরবর্তীতে তারা এসব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন, এবং তারা তাদের উন্নয়ন সাধন করতে থাকেন, যতক্ষণ না তারা মানববিহীন গাড়ি, মানববিহীন প্লেনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হোন।

অনেকে বিষয়টি এভাবে দেখেন যে যুদ্ধক্ষেত্রগুলো শুধু ইরাক ও আফগানিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকুক; কিন্তু নতুন নতুন যুদ্ধ ক্ষেত্র জমায়েত ছড়িয়ে দিবে। কারণ আমেরিকার বিরুদ্ধে নতুন নতুন যুদ্ধ ক্ষেত্র তার বাহিনী ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে দিবে, তথাপি সে বুঝতে পারবে না যে কোথায় তার শক্তিকে কাজে লাগানো উচিৎ। একটি প্রবাদ আছে যে,

“শিকারীর সামনে যখন অনেক হরিণ আসে তখন শিকারী অনিশ্চয়তায় পড়ে যায় কোনটা শিকার করবে।”

সর্বোপরি, এটা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক যে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে যতটুকু তার সামর্থ্য আছে তদানুযায়ী। যেই মুজাহিদীনদের সাথে যোগদান করতে সমর্থ, তার উচিৎ তাদের সারিতে যোগ দেওয়া, যদি তা না পারে, তবে তার উচিৎ চারিদিকে খোঁজ করা কোন কুফরের মস্তকের যাতে আঘাত করলে তাদের হিংস্রতা দমিত হবে যারা অবিশ্বাস পোষণ করে।

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি ভীতি জিহাদের পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর উত্তম প্রতিষেধক হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) করা, একটা শত্রু পর্যবেক্ষণ করা ও ট্রিগারে টান মারা, অথবা ‘রান্না সামগ্রী’ বিস্ফোরণ করে তাকে উড়িয়ে দেওয়া। নিশ্চয়ই সবচেয়ে তীক্ষ্ণ মানুষ তারাই যারা নিজের কর্মকে বিশ্বস্ত হৃদয়ে দাফন করে।

“আর যে কেউ জিহাদ করে, সে তাহলে নিশ্চয়ই সংগ্রাম করে তার নিজেরই জন্যেই।”
[২৯: ৬]